লাঙল: কালের বিবর্তনে প্রায় বিলুপ্তির পথে

*কৃষিতে বর্তমান সময়ে অনেক আধুনিক প্রযুক্তি এসেছে। তবে কৃষি প্রযুক্তির উন্নতির মূলে ছিল লাঙল। অনেকেই লাঙল উদ্ভাবনকে নগণ্য বিষয় মনে করতে পারেন। কিন্তু এই লাঙলের উদ্ভাবন না হলে পৃথিবীর অনেক কিছুই উদ্ভাবন হতো না। লাঙল আবিষ্কারের আদ্যোপান্ত নিয়ে জানাচ্ছেন **শিশির আহমেদ**।*

লাঙল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ ‘লঙ্গ’ থেকে। এ ধীরে ধীরে লাঙল শব্দটি বাংলা ভাষায় আবির্ভূত হয়। তবে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কিভাবে লাঙল আমাদের কাছে এলো? লাঙলের উৎপত্তি সম্পর্কে গবেষকরা জানান, লাঙল কখনই এককভাবে আবিষ্কার হয়নি। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ক্রমাগত উন্নয়নের ফসল আজকের এই লাঙল। মানবজাতি সৃষ্টির পর থেকেই বিভিন্নভাবে কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাই জমি প্রস্তুত করার জন্য একটি বিশেষ যন্ত্রের বেশ প্রয়োজন ছিল।

ভারত উপমহাদেশে সিন্ধু সভ্যতায় আনুমানিক ২০০ খ্রিষ্টাব্দে লাঙলের ব্যবহার করা হয়। সেসময় এই সভ্যতা অর্থনৈতিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বেশ সমৃদ্ধ ছিল। তবে খাদ্যের জন্য তাদের অন্য সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল হতে হতো। এই ঘাটতি পূরণের জন্য তারা নিজেরা খাদ্য উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেয়। তাই জমি প্রস্তুতের জন্য তারা জীবজন্তুর হাড় দিয়ে লাঙলের মতো একটি বস্তু তৈরি করে। তবে এই লাঙলের যথাযথ ব্যবহার ও প্রচলন হয়েছে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন বাংলায়। কাঠমিস্ত্রিরা কাঠের তৈরি এক ধরনের লাঙল তৈরি করেছিলেন। তারা লাঙলের দুটি অংশ তৈরি করেছিলেন যার একটি অংশের নাম ছিল হাল বা লাঙল এবং অন্যটি জোয়াল; যা গরু বা মহিষের কাঁধে রেখে জমি চাষ করা হতো। তবে কৃষিকাজের জন্য উপযুক্ত লাঙল তৈরি হয় আনুমানিক ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন চীনে। চীনের অধিকাংশ স্থানের আবহাওয়া বেশ প্রতিকূল তাই তারা টেকসই করার জন্য লোহার তৈরি লাঙল তৈরি করেছিল। কিন্তু তখনও সেসব লাঙল সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযুক্ত ছিল না। এরপর এই প্রযুক্তি ছড়িয়ে যায় ইউরোপ-আমেরিকায়। বাণিজ্যিকভাবে বাস্তবসম্মত লাঙল উৎপাদনের কথা প্রথম চিন্তা করেন মার্কিন কামার চার্লস নিউবোল্ড এবং ডেভিড ময়ুর। ১৭৯৭ সালের জুন মাসে তিনি লোহার লাঙল তৈরির জন্য একটি পেটেন্ট পান।

এরপর ১৮১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয়ের কামাররা এক ধরনের লাঙল তৈরি করেন যার মধ্যে লোহার সূচ ছিল, যা মাটিকে গভীরভাবে আঁচড়ে দিতো। এর ফলে জমি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এই লাঙল বেশ ভূমিকা রাখে। তবে সেসময় এইসব লাঙলের দাম ছিল আকাশচুম্বী। লাঙলের একটি অংশ নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় লাঙল কিনতো হতো। কিন্তু সেসময়ের কৃষকরা ছিল বেশ দরিদ্র, তাই এসব লাঙল কেনা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৃষকদের কথা ভেবে মার্কিন উদ্ভাবক জেথ্রো উড নতুন ধরনের একটি লাঙল উদ্ভাবন করেন, যা তিনটি অংশে ভাগ করা ছিল এবং প্রতিটি অংশ প্রতিস্থাপন করা যেত। এরপরের ইতিহাস তো সকলেরই জানা। দীর্ঘদিন লাঙল আমাদের গ্রামবাংলায় কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়।

লাঙল উৎপাদনের শুরুতে এর ব্যবহার খুব সীমিত পর্যায়ে হলেও, বর্তমানে বেশ কয়েক রকমের শক্তিশালী এবং স্বয়ংক্রিয় লাঙল পাওয়া যায়।

মোল্ডবোর্ড লাঙল: মোল্ডবোর্ড লাঙল হলো সবচেয়ে প্রাচীন এবং প্রচলিত লাঙলগুলির মধ্যে একটি যা প্রাথমিক জমি চাষের কাজে ব্যবহৃত হয়। এই লাঙলটি বাঁকা ব্লেড নিয়ে গঠিত যা মোল্ডবোর্ড নামে পরিচিত।

ডিস্ক লাঙল: আধুনিক যুগের কৃষিতে এই লাঙল খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র। এটি বিভিন্ন রকম জমি চাষ দিতে পারে। এতে কৌণিক অবতল ব্লেড রয়েছে যা পৃষ্ঠকে পিষে ও ঘুরিয়ে দিতে সাহায্য করে। তবে এই লাঙলটি অত্যন্ত কার্যকর, কেননা এটি শক্ত ও শুষ্ক মাটি বেশ ভালোভাবে কাটতে পারে এবং মাটিতে থাকা উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশও কাটাতে পারে।

চিজেল লাঙল: চিজেল লাঙল হলো একটি কৃষি উপকরণ যাতে রয়েছে বেশ কয়েকটি সরু টেপারড শ্যাংক। শ্যাংকগুলো মাটিতে প্রবেশ করে ঘুরতে থাকে যার ফলে মাটি সহজে ভেঙে যায়, গভীর গর্ত হয়। এটি পাথুরে ও জলা মাটির জন্য বেশ ভালোভাবে কাজ করে। কিন্তু এই লাঙল ব্যবহার বেশ জটিল।

সাবসয়লার লাঙল: গভীর চাষের জন্য সাবসয়লার লাঙলগুলো তৈরি করা হয়। পাহাড়ি ও পাথুরে এলাকায় এ ধরনের লাঙল অত্যন্ত উপকারী। এই লাঙলের ব্লেডগুলো চিজেল লাঙলের মতো তবে বেশ শক্তিশালী। একটি সাবসয়লার লাঙল প্রথম ঘূর্ণনে মাটির প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার গভীরে যেতে পারে। তবে এই লাঙল নিচু জমিতে কাজ করতে পারে না।

রোটারি লাঙল: এই লাঙল সাধারণত 'রোটাভেটর' নামে পরিচিত। প্রাথমিক চাষাবাদের জন্য এই লাঙল বেশি ব্যবহার করা হয়।

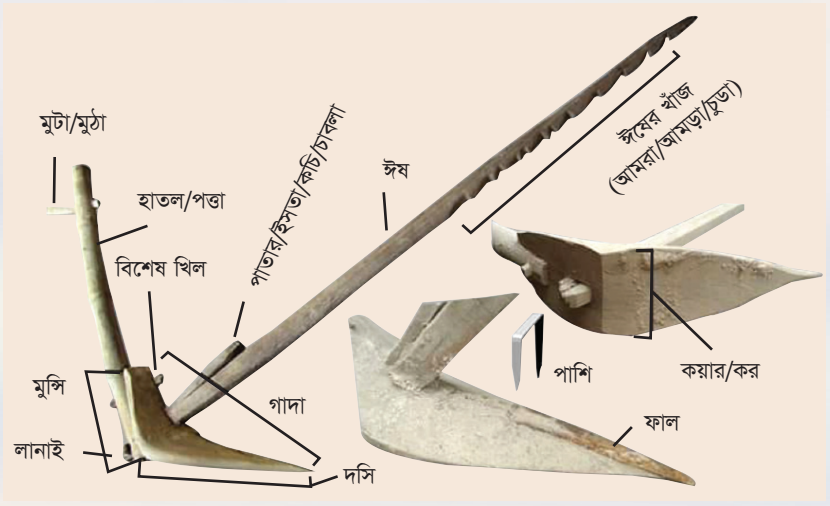

লাঙলটির মাথায় একটি ঘূর্ণায়মান ব্লেড থাকে যা মাটিকে মন্থন এবং পাল্‌ভারাইজ করে। মৌসুমি ফসল এবং জলাভূমির জন্য এই লাঙল বেশ কার্যকর।

রিজিং লাঙল: বীজতলা তৈরির জন্য চূড়া তৈরি করতে হয়। এই লাঙল সেই চূড়া তৈরি করার জন্য বেশ পারদর্শী। এই লাঙল সারি ফসলে সহজে সেচ দিতে পারে এবং আগাছা পরিষ্কার করার জন্য এই লাঙল বেশ কার্যকর।

হাইড্রোলিক রিভার্সিবল লাঙল: জলবাহী এবং এটি উভয় দিকে কাজ করার সক্ষমতা থাকার কারণে এই লাঙল কৃষকদের বেশ পছন্দের। এই লাঙলের মাধ্যমে একসঙ্গে সামনে পিছন যাওয়া যায়। যার কারণে এগুলো প্রচলিত লাঙলের তুলনায় অনেক বেশি ফলপ্রসূ। তবে এই লাঙল মেরামতের জন্য বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন এবং ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ব্যয়বহুল।

লাঙলের চর্চা শুধুমাত্র কৃষকরাই করেননি। সাহিত্যেও লাঙলের দেখা পাওয়া যায়। লাঙল সম্পর্কে অনেক কবি লিখে গেছেন। এর মধ্যে অন্যতম কবি মালাধর বসু তার রচিত 'লাঙলের ইস যেন দন্ত সারি সারি', 'ষোলো শতকের কবি' ও 'কবিকঙ্কন' রচনায় লাঙলের কথা বলেছেন। বাংলার বিখ্যাত কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তার অনেক কবিতায় কৃষক এবং লাঙলের কথা উল্লেখ করেছেন। সমসাময়িক আর এক কবি বৃন্দাবন দাসও তার কবিতায় লাঙল সম্পর্কে লিখেছেন। লাঙল ও কৃষকদের নিয়ে বলে গেছেন কবি জসিমউদদীন। তার কবিতা-গল্পে ফুটে ওঠে গ্রামের কৃষকদের কষ্ট। তার অনেক রচনায় তিনি লাঙল শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি বাঙালির শত বছরের কাঠের লাঙল কালের বিবর্তনে এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। লাঙল দিয়ে হাল চাষ করা এখন আর তেমন চোখে পড়ে না। চাষাবাদের অন্যতম উপকরণ হিসেবে কাঠের লাঙল ছিল অপরিহার্য। একসময় লাঙল ছাড়া গ্রাম বাংলায় চাষাবাদের কথা চিন্তাই করা যেত না। এখন ট্রাক্টর সে স্থান দখল করায় দিনে দিনে হারিয়ে যেতে বসেছে কাঠের লাঙল। আগের দিনে গরু দিয়ে হাল চাষ ও ধান মাড়াইয়ের যে আনন্দ ছিল, বর্তমানে সেই আনন্দে অনেকটা ভাটা পড়েছে। সর্বত্রই লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি উপকরণেও চলে এসেছে আধুনিকতা। এতে যেমন কৃষকের পরিশ্রম কম হয়, তেমনি সময়ও বেঁচে যায়। ক্ষেতে খামারে কৃষকের লাঙল ও মই দিয়ে চাষাবাদের দৃশ্য সবার নজর কাড়তো এক সময়। এখন আর গ্রামগঞ্জে লাঙল, জোয়াল, মই ইত্যাদি সরঞ্জাম সাজিয়ে বসতে দেখা যায় না বিক্রেতাদের। অতীতের সেই খামারের ঠক ঠক শব্দ আর কানে আসে না। তবে এটাও সত্যি কৃষকের কাঠের লাঙলের চাষ থেকে যান্ত্রিক চাষে কষ্ট বেশ কম হয়।